Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের থাকার বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইমা নাসরিন

রোলঃ 227022449

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের থাকার বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইমা নাসরিন

রোলঃ 227022449

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিম দেশে মুসলমানদের থাকার বিধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাইমা নাসরিন, আইডিঃ 227022449 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিম দেশে মুসলমানদের থাকার বিধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Saima Nasrin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সাইমা নাসরিন

আইডিঃ 227022449

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ইসলাম এক যুগপোযোগী জীবন ব্যবস্থা 7

অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকার 8

অমুসলিম রাষ্ট্রে যাওয়ার বিধান 9

দাওয়াহর জন্য 9

রিফিউজি হিসেবে থাকা 11

ইসলাম এবং ভ্রমণ। 12

জীবিকার জন্য 15

নাগরিকত্বঃ 17

অমুসলিম দেশে যাওয়া যাবে না যে কারণে 20

বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে 22

পরবর্তী প্রজন্মের জন্য 23

তীর্থস্থান পরিদর্শন 23

কিছু প্রতিবন্ধকতা 25

উপসংহার 28

ভূমিকা

আজকাল বিভিন্ন কারণে মানুষ ইউরোপ দেশগুলোতে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য বেশ আগ্রহ সহকারে যেতে দেখা যায় এমনকি ইউরোপের দেশগুলোতে গিয়ে থাকাটাই জীবনের সফলতা হিসেবে মনে করা হয়কিন্তু এর বিধান কি সরিয়া এই ও মুসলিম দেশে থাকার কোন বাধ্যবাধকতা আছে কিনা সে সম্পর্কে অনেকে বেখেয়াল দেখা যায়। আসলেই যাওয়া যাবে কিনা গেলেও কি কারনে কি শর্ত রয়েছে তা জানাটা একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের জন্য বাঞ্চনীয়।কারণ এটি এমন একটি মাসআলা যা স্থান-কাল পাত্র ভেদে মাসআলা ভিন্ন হতে পারে।এখানে যে ব্যক্তি বসবাস করবে তার মন মানসিকতার উপর ভিত্তি করেও হুকুম ভিন্ন হতে পারে।

তিন. আমাদের ফিকহের পুঁজি

ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের বিশাল ভান্ডারের বড় একটি অংশ উল্লিখিত বিজয়যুগেরই কীর্তি। সে সময় আলিম ও ফকিহরা মুসলিমদের বিজয়ী একটি জাতি ধরে নিয়ে অমুসলিমদের সঙ্গে তাদের মেলামেশাসংক্রান্ত মাসআলা ও আচরণনীতি নিয়ে কাজ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে তখন যে অবস্থা তাঁদের সামনে ছিল এবং মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্কের যেসব ধরন তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, ফকিহরা সে অনুযায়ী বিধানাবলি নির্ণয় করেছেন। এজন্য আমাদের ফিকহে সিয়ার, জিহাদ, সন্ধি, ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বৈধাবৈধতার অধ্যায়গুলোতে যেসব মাসআলা- মাসায়িল রয়েছে, সেগুলোতে ওই বিজয়ী সময়ের প্রতিফলনই দেখা যায়। তাই ইমাম মালিক রাহ-এর আল-মুদাউওয়ানা, ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর কিতাবুল খারাজ, ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর জাহিরুর রিওয়ায়াত, ইমাম শাফিয়ি রাহ.-এর কিতাবুল উম্ম থেকে আলমগিরি, শামি এবং মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়া পর্যন্ত সকল ফিকহি গ্রন্থে অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক বিষয়ের ওপর মোটামুটি একই ধরনের আলোচনা দেখা যায়। আজকের দিনে আমরা কী করে ভাবতে পারি যে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে এবং মুসলিমরা আবার মদিনার প্রথম যুগে বা হাবশা ও মক্কার যুগে ফিরে যাবেন। অবশ্য হাদিসে আগের অবস্থায় ফেরার ইঙ্গিত রয়েছে:

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا

ইসলাম এসেছে অপরিচিত হিসেবে, তারপর আবার সে তার শুরুর অবস্থার দিকে ফিরে যাবে।'

কুরআন-হাদিসের মৌলিক নীতিমালা এবং ফিকহের 'ইজতিহাদি' (গবেষণাপ্রসূত) নীতিমালায় এটাই পার্থক্য যে, কুরআন-হাদিসের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে মানবজীবনের সকল স্তর ও যুগের দিকে প্রথম থেকেই লক্ষ রাখা হয়েছে। আর এটিই

'সহিহ মুসলিম: ১৪৫; সুনানু ইবনি মাজাহ ৩৯৮৬; তাবারানি: ৬১৪৭।

তার সকল যুগের উপযোগী হওয়ার মূল রহস্য। এর বিপরীতে প্রত্যেক যুগের ফিকহি ইজতিহাদ স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অবশ্য কুরআন-হাদিসের বুনিয়াদি নীতিমালায় কোনো যুগেই কোনোরকম পরিবর্তন হওয়ার নয়। ফকিহরা কেবল নিজেদের যুগের অবস্থা ও ঘটনাবলির সঙ্গে সম্পৃক্ত মাসআলার সমাধান উদ্‌ঘাটনে নিয়োজিত থাকেন। যদি প্রত্যেক অবস্থায় তাদের দায় মেনে নেওয়াও হয়, তবু সাধারণভাবে নিজেদের স্থান-কাল-পাত্রের আয়নায় যা তাঁদের দৃষ্টিগোচর হবে, তাঁরা তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর কালোত্তর ফিকহ এই অর্থে একটি বিরাট বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর এই কালোত্তর ফিকহকে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক তৈরি হয়নি। তাই ফকিহরা প্রধানত নিজেদের যুগের অবস্থা ও মাসআলার ওপরই তাঁদের প্রয়াস নিবন্ধ রেখেছেন। অর্থাৎ, যে-মাসআলার প্রয়োজন ছিল এবং যে-মাসআলা মীমাংসার জন্য তাঁরা দায়বদ্ধ ছিলেন, কেবল সেগুলো নিয়েই তাঁরা গবেষণা করেছেন।

বর্তমান যুগ হলো উম্মাহর রাজনৈতিক অবনতির যুগ। এ যুগে দেশে দেশে মুসলিমরা শুধু রাষ্ট্রপরিচালনার শক্তিসামর্থ্য থেকেই বঞ্চিত নন, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নিজেদের রাষ্ট্র বা অন্যান্য জাতির ওপর প্রভাব খাটানোর সাধ্যও তাদের নেই। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উম্মাহর অবস্থা নবির যুগের উল্লিখিত তিন উদাহরণের মধ্য থেকে কোনো একটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কাজেই এ তিনটির যেকোনো একটিকে আমরা আমাদের মাইলফলক বলে ধরতে পারি। আমাদের ফিকহের মৌলিক নীতিমালা এ ব্যাপারে এখনো বলতে গেলে নীরবই। তবু, সেসব মৌলিক নীতিমালায় বর্তমান পরিস্থিতির দিকে কিছুটা ইঙ্গিত তো নিশ্চয়ই রয়েছে। আর সালাফ তথা পূর্ববর্তীদের ইঙ্গিতও খালাফ তথা পরবর্তীদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। এজন্য সংখ্যালঘুবিষয়ক 'ফিকহ' সম্পর্কে গবেষক আলিমদের কর্তব্য হবে এসব ইঙ্গিতকেও অন্ধকারে আলোকবর্তিকা হিসেবে নিজেদের সামনে রাখা।

* ভবিষ্যতে যেসব সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেসব ঘটার আগেই ইমাম আবু হানিফা রাহ, সমাধান

বের করে রাখতেন। 'কালোত্তর ফিকহ' বলে তা-ই বোঝানো হয়েছে।

ইসলাম এক যুগপোযোগী জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা আমাদের কেমন হবে তা আমাদের জন্য স্পষ্ট করেছেন।কুরআন সুন্নাহ এবং কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক ফকিহগণ এর ইজতিহাদের মাধ্যমে।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য কুরআনকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নাযিল করেছেন যেন মানুষ রাসূলের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা নিতে পারে এবং রাসুলের সিরাতেকেও বিভিন্ন শিক্ষা নিয়ে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার মাধ্যমেও রয়েছে ইসলাম থেকে পাওয়া বিধানগত শিক্ষা।

কোরআন, হাদিস, নবী রাসুলের জীবনী থেকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনার সমস্ত মানব কুলের জন্য অনুসরণীয় নবী জীবনের পূর্ণ জীবনকে ভাগ করলে যে তিন ভাগ উঠে আসে তার মধ্যে প্রথমে

১.মক্কি জীবন

২.হাবসার জীবন

৩.মাদানী জীবন

বর্তমানে মুসলমানরা যেই পরিস্থিতিতে অমুসলিমদের সাথে বা তাদের দেশে কিভাবে কোন উদ্দেশ্যে যেতে পারবে তা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের এই তিন ভাগ থেকে যেকোনো এক ভাগের সাথে মিলে যায়।

অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভাগ করে যে তিন ভাগ পাওয়া যায় সেই দিক প্রেক্ষাপটে ফকিহগণ অমুসলিম দেশগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং তার জন্য আলাদা আলাদা বিধান বর্ণনা করেছেন।

এক.অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা মুসলমানদের জন্য ঝুঁকি এমন পর্যায়ে যে, তার নিজের এবং পরিবারের জানমালের কোন নিরাপত্তা সেখানে থাকে না এবং শরয়ী বিধান অর্থাৎ দিন পালন করা একেবারেই দুষ্কর,ধর্মীয় কোন কিছুতেই স্বাধীনতা নেই এমন দেশে নাজায়েজ হবে বসবাস করা বা যাওয়া।বরং সামর্থ্য থাকলে ওই দেশ থেকে কোন মুসলিম প্রধান দেশে হিজরত করা তখন তার জন্য সবচেয়ে বেশি উত্তম হবে অর্থাৎ দিনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ যেখানে সেখান থেকে হিজরত করতে হবে কারণ আল্লাহ্ পাক সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াতে বলেন

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ
قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۙ

যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।

সুতরাং যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদের অবশ্যই এমন ঝুঁকিপূর্ণ স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

দুই.যে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের থাকতে হয় অসম্মানিত হয়ে যেখানে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই কিন্তু হিজরত করার মতো শক্তি সামর্থ্য একেবারেই না থাকে তাদের জন্য হিজরত না করায় কোন গুনাহ হবে না এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৯৮ নম্বর আয়াতে বলেন

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۙ

তবে সেই সকল অসহায় নর, নারী ও শিশু (এই পরিণতি হতে) ব্যতিক্রম, যারা (হিজরতের) কোনও উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং (বের হওয়ার) কোনও পথ পায় না।

তিন.
যে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে না যেখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয় না এবং পরবর্তী প্রজন্মের ঈমান রক্ষা করে চলা নিয়ে কোন বাধা থাকে না এমন অমুসলিম দেশে থাকা জায়েজ বলেছেন হানাফী ও হাম্বলী আলিমরা।

অমুসলিম রাষ্ট্রে যাওয়ার বিধান

কিছু বিধি-বিধান মেনে কিছু ক্ষেত্রে মুসলিম দেশে যাওয়া যেতে পারে তার মধ্যে কিছু নিচে উল্লেখ করা হল।

১.দাওয়াহর জন্য
২.রিফিউজি হিসেবে
৩.চিকিৎসার জন্য
৪.ইলম অর্জনের জন্য
৫.ভ্রমনের জন্য
৬.জীবিকার উদ্দেশ্যে
৭.নাগরিকত্ব

দাওয়াহর জন্য

যদিও ঈমান আমল জীবনের ঝুঁকি পরিবারের প্রাণনাশের ঝুঁকি বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্তিতিতে অমুসলিম দেশে থাকার বিধান নেই কিন্তু যদি সেখানে থাকার উদ্দেশ্য হয় একমাত্র দিন প্রচার এবং ইসলামকে, ইসলামের সৌন্দর্যকে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেওয়া তাহলে দুটি শর্তে যাওয়া যেতে পারে।সেই শর্ত দুটি হল
এক.নিজের পর্যাপ্ত দ্বীন সম্পর্কে ইলম থাকা। যেন সেখানের বেহায়াপনা বিভিন্ন অনৈতিক এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এমন সব বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যাপক দৃঢ়

থাকতে পারে। দ্বীন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ইলম না থাকলেতাদের এমন সূক্ষ্ম কুবুদ্ধির ফাঁদে পড়ে যাওয়ার চান্স থেকে যায়।

দুই.তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় ও প্রচলিত রীতিনীতি যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সেসব থেকে দূরে থাকার পর্যাপ্ত মনোবল।

এসব দিক মেনে সেখানে দিনের স্বার্থে থাকাতে কোন বাধা নেই বরং তা মুস্তাহাব।আমাদের মহান ব্যক্তিরা এভাবে বিভিন্ন অমুসলিমদের সাথে থেকে তাদের দেশে সফর করে নিজের চাল চলনের বিভিন্ন দিক উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলায় অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে এবং আগ্রহ তৈরি হয়। নিজের দিন আমল হেফাজতকারী ব্যক্তিদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তি এজন্য ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে অমুসলিম দেশে যাওয়াটা সওয়াবের কাজ।আল্লাহ তায়ালা সূরা তওবার ১২২ নাম্বার আয়াতে বলেন

وَمَا كَانَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لِيَنۡفِرُوۡا كَآفَّةً‌ؕ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِنۡ كُلِّ فِرۡقَةٍ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوۡا فِى الدِّيۡنِ وَلِيُنۡذِرُوۡا قَوۡمَهُمۡ اِذَا رَجَعُوۡۤا اِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُوۡنَ ٪

মু’মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, এদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে আর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।

সুতরাং ইসলামকে spread out করার জন্য কিছু মুমিন সেই দেশে গিয়ে দাওয়াত দেওয়াটা অনেক ইম্পরট্যান্ট বিষয়। সাহাবারা এরকমটা করেছেন তিনারা দাওয়াত দেওয়ার জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়েছেন,থেকেছেন তাবেয়িরা এবং তাবেতাবেয়িরাও এভাবে ইসলামকে প্রচার করার জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে থেকেছেন তিনারা এই সেক্রিফাইস করেছেন আল্লাহ তায়ালা একটা অঞ্চলকে কয়েকজন সাহাবী দ্বারা ইসলামের জন্য কবুল করেও নিয়েছিলেন

এখন as a representative of Islam আমরা কতটুকু ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করছি তাও ভাবার বিষয় বরং এখন অনেককে দেখা গিয়েছে অমুসলিমদের দেশে গিয়ে তাদের মত হয়ে যাচ্ছে তাদের লাইফস্টাইল তাদের মটো তাদের চিন্তাধারা তাদের সংস্কৃতির সাথে নিজেকে মিশিয়ে তাদেরটাকেই বেটার মনে করা শুরু করে দিয়েছে তাই যারা জীবিকা বা উচ্চতর ডিগ্রি অথবা অন্য যেকোনো কারণে অলরেডি চলে গিয়েছে সেই দেশে তাদের উচিত হবে এখনই নিজেদের ওই দেশে থাকার পারপাস চেঞ্জ করে ,নিজে বিভিন্ন মাধ্যমে অনলাইন অফলাইন যেভাবেই হোক ইলম অর্জন করে সেখানে থাকার মেইন উদ্দেশ্য 'দাওয়াহ্' করে

নিতে হবে। আর যারা তাদের মত বা তাদের কালচারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে তাদেরকে অতি দ্রুত সেই চিন্তাদ্বারা থেকে ফিরে আসতে হবে।

রিফিউজি হিসেবে থাকা

কোন মুসলিম দেশে যদি কারো উপর এমন পর্যায়ে জুলুম অত্যাচার হয় যে তার জান মাল রক্ষা করতে না পারা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং অন্যকোন মুসলিম রাষ্ট্রে তার থাকার ব্যবস্থা না হয় সে ক্ষেত্রে তার জান মাল এবং জুলুম অত্যাচার থেকে বাঁচতে অমুসলিম দেশে থাকার অনুমতি আছে সে ক্ষেত্রে দুটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে

এক.ও মুসলিম দেশ হলেও এমন সুযোগ থাকতে হবে যে ইসলামের সকল বিধানসে নির্দ্বিধায় পালন করতে পারবে

দুই.মুসলিমদের জন্য বাধা বা বিপত্তি হয় এমন কাছ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত রাখবে।

এর দলিল হল, সাহাবাগণ মক্কায় কুরাইশদের কাছে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তখন হাবশায় কাফেরদের রাজত্ব চলছিল। তখন সাহাবায়ে কেরাম সেখানে অবস্থান করেছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পরও কোন কোন সাহাবী সেখানে অবস্থান করেছিলেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) খায়বার যুদ্ধের সময় ফিরে এসেছিলেন। তখন ছিল হিজরী সপ্তম বছর। আর মানুষের আত্মিক অধিকার হল যে, সে তার নফস বা আত্মাকে যে কোন ধরনের অন্যায় ও জুলুম থেকে নিরাপদে রাখবে। সুতরাং যদি সে কোন কাফের রাষ্ট্র ছাড়া নিজের জন্য কোন নিরাপদ স্থান না পায় তাহলে তার জন্য সেখানে হিজরত করাতে কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হবে এবং হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।(দলিল মুসলিম বাংলা অ্যাপ থেকে)

চিকিৎসার জন্য

কারও অসুস্থতার ধরণ এমন হয়েছে যে নিজ দেশে বা কোন মুসলিম দেশে তার সে সুব্যবস্থা নেই। সেক্ষেত্রে অমুসলিম দেশে যাওয়া যেতে পেরে তবে তার মধ্যেও এমন দেশ বাঁচায় করতে হবে যে ধর্ম পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে পালন করা যায়।

ইলম অর্জন

ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ ইবাদত। অবশ্যই তা উপকারী ইলম হতে হবে। উপকারী ইলম বলতে যে ইলম দ্বীনের জন্য ইসলামের জন্য।
বর্তমানে পশ্চিমারা সবদিক থেকে এগিয়ে। প্রত্যেক মুসলমান ইলমে দ্বীন অর্জন করার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় কিন্তু পার্থিব জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য যদি হয়, উম্মাহর উপকার,খেদমত উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাও ইবাদতের পরিণত করা যায় ইনশাআল্লাহ।বর্তমানে পশ্চিমারা যেভাবে সবকিছুতে এগিয়ে আছে তা পার্থিব ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উন্নতি সাধনের শীকড়ে। বর্তমানে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বতা করার মত এখন কোন জাতি নায়। মুসলমানদের উচিত হবে প্রাশ্চাত্যের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখে বস্তুবাদের এই পৃথিবীতে অবস্থান তুলে ধরতে এবং মানব কল্যাণে উপকারে কাজে লাগাতে।নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতার প্রদান এবং প্রথম শিক্ষক তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য সফরের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন: যে জ্ঞান অন্বেষণে বের হয় সে যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ আল্লাহর পথে থাকে।সুতরাং বুঝা যায় ও মুসলিম দেশে মুসলমানদের জ্ঞান অর্জনের জন্য যাওয়াতে কোন দোষ নেই কিন্তু কিছু শর্ত মানা জরুরী।
যেমন ১.এমন দেশ সিলেক্ট করা যেখানে দিন পালনে বাধা থাকবে না
২.যে জ্ঞানের জন্য বের হয়েছে তা যেন দিনের উপকারে আসে।
৩.শরীয়ত ও দিন বিরোধী কোন কাজ করা যাবে না
৪.সেখানে ধর্মীয় গবেষণা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ইসলাম এবং ভ্রমণ।

মহান আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীকে কি অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।রংবেরং এর মানুষ,প্রাণীকুল ইত্যাদি দ্বারা এ পৃথিবীকে ঐশ্বর্য্যময় করে সাঝিয়েছেন।পাহাড়-পর্বত নদী-নালা খাল-বিলকে ভারসাম্যপূর্ণ করে কতইনা সুনিপুণ ভাবে গড়েছেন।পৃথিবীকে স্বর্গের প্রেরণাকারী রূপে রূপায়িত করেছেন।সবই করেছেন একমাত্র

মানুষের সেবার জন্যে।আর এ সবকিছই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রমাণ রাখে। আল্লাহর মাহাত্ম্যর প্রমাণের জন্য পৃথিবীর যে কোনো একটি প্রাণীই যথেষ্ট।আল্লাহ তা'আলার নিপুণ শিল্পে শিল্পায়িত এ পৃথিবীকে দেখা ও জানা এবং এ সম্পর্কে গবেষনা করা প্রতিটি মানুষের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
তরজমাঃ- বলুন! তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ! কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন।অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন।নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।(সূরা আনকাবুত-২০)

পৃথিবীকে ঘুরে দেখা ও তার কিছু মিথ্যা অধিবাসীদের উপর আল্লাহ তা'আলার আপতিত আযাব দেখে সত্যর শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ
قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
তরজমাঃ-বলে দিনঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতপর দেখ! মিথ্যারোপ কারীদের পরিণাম কি হয়েছে?(সূরা-আন'আম-১১)

তাফসীরে ক্কুরতুবী নামে প্রসিদ্ধ "আল জামে লি-আহকামিল কুরআন" এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়,
وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم ، وأهل الديار ، والعاقبة آخر الأمر .
তাওহীদের শিক্ষাগ্রহণার্তে পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীদের উপর আপতিত আযাবের নিদর্শনবাহী এলাকা পরিভ্রমণ করা মুস্তাহাব।যাতে করে পরবর্তী উম্মত শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

ভ্রমণের প্রকারভেদ সম্পর্কে চার মাযহাব সম্বলীত সর্ব বৃহৎ ফেক্বাহী গ্রন্থ "আল-মাওসু'আতুল ফেক্বহিয়্যায় " উল্লেখ করা হয়,
قسم الحنفية السفر من حيث حكمه إلى ثلاثة أقسام: سفر طاعة كالحج والجهاد، وسفر مباح كالتجارة، وسفر معصية كقطع الطريق وحج المرأة بلا محرم.
হানাফি উলামায়ে কেরামগণ সফরকে তিনভাগে ভাগ করে থাকেন।নেকীর সফর যেমনঃ- হজ্ব ও জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর ও ইত্যাদি।বৈধ সফর যেমনঃ- ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর ও

ইত্যাদি।অবৈধ সফর যেমনঃ- ডাকাতি ও মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের হজ্বের সফর ও ইত্যাদি।(২৫/২৭)

অমুসলিম দেশ বা এমন মুসলিম দেশ যেখানে প্রকাশ্যে গোনাহ সংগঠিত হয়ে থাকে,এমন দেশ সমূহে সফর করা বৈধ হবে কি না?

এমন প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে,এ সম্পর্কে বিন বায রাহ এর একটি ফাতাওয়া উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ মূলত অমুসলিম দেশ সমূহে না যাওয়াই ফিকহ সম্মত।তবে যদি প্রয়োজনবোধে যেতেই হয় তাহলে এক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে।

তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধঃ

(১) ভ্রমণকারীর কাছে প্রয়োজনীয় ইল্ম বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সকল সন্দেহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

(২) তার কাছে এমন দ্বীনদারী বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সে নফসের প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হবে।

(৩) অমুসলিম দেশে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকা।

উপরের শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অমুসলিম দেশে সফর করা বৈধ নয়। কেননা এতে ফিতনার ভয় রয়েছে।এবং তাতে প্রচুর সম্পদও বিনষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া গোনাহের কাজ করা ও দেখা এবং তাতে যেকোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা নাজায়েজ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ

তরজমাঃকোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে।(সূরা-নিসা-১৪০)তবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয় যেমন চিকিৎসার জন্য অথবা শিক্ষা অর্জনের জন্য, যা অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না, তা হলে কোন অসুবিধা নেই।

পর্যটনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার কোন দরকার নেই; বরং এমন ইসলামী দেশে যাওয়া যায় যেখানে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা হয়। আমাদের ইসলামী দেশসমূহে আল্লাহর মেহেরবাণীতে যথেষ্ট পর্যটনের স্থান রয়েছে। সেখানে পর্যটনের জন্য যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ছুটি কাটানো সম্ভব।

জীবিকার জন্য

নিজের দেশে আপ্রাণ চেষ্টা করেও যদি জীবিকা অর্জনের কোনো বন্দোবস্ত করতে না পারে অবস্থা এমন যে দৈনন্দিন জীবন চলা ও কষ্টকর হয়ে যায় এবং অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। স্বদেশে চেষ্টা করেও কোন ব্যবস্থা না হয় এবং অমুসলিম দেশে apply-এর সুযোগ হয় এবং, Confirm হয়ে যায় তাহলে কিছু শর্ত সাপেক্ষে সেখানে গিয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারবে।যেমন

১. দ্বীনের উপর অটল থাকার এবং নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্নত রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকতে হবে।
২. সেখানকার বেহায়াপনা, অবাধ চলাফেরা ইত্যাদি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যাপারগুলো থেকে বেঁচে থাকবে তাহলে সেখানে গিয়ে হালাল উপায়ে জানাল উপার্জন করার অনুমতি রয়েছে

কারণ আল্লাহ তাআলা জীবিকা অর্জনকে ও অনন্য ফরযের মত ফরয করেছেন। জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন নির্দিষ্ট জাযগার কথা ইসলামে বলা হয়নি সুতরাং যেখান থেকে হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা হয় --সেখানে জীবিকা উপার্জন করতে পারবে।এ প্রসঙ্গে
আল্লাহ তাআলা বলেন
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور
'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর এবং তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।' (সূরা মূলক : আয়াত ১৫)
অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাস, চাকরি, লেখাপড়া ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করার বিধান নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের অবস্থা এবং ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাদের মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায়। বিশিষ্ট্য ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ,ড. ইউসুফ আল কারযাভি রহ. বলেছেন, অমুসলিম দেশগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. যেখানে ধর্মবিদ্বেষ প্রবল : যেসব দেশে সাধারণভাবেই ধর্মবিদ্বেষ প্রবল। বিশেষত যেসব দেশের মানুষ ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সন্ত্রাস বলে এবং যেসব দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামবিদ্বেষ

উসকে দেয়, সেসব দেশের স্থানীয় মুসলিমরা সেখানে ধৈর্যসহ বসবাস করবে এবং দ্বিনের ব্যাপারে যেন শীথিলতা চলে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

তাদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের অবকাশ হলো, 'কিন্তু কেউ অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা নাহল, আয়াত : ১১৫)

তবে কোনো মুসলিম দেশ থেকে এমন দেশে হিজরত (দেশান্তর) করা বৈধ নয়। কেননা যেখানে ইসলাম দ্বিন পালনের সুযোগ না থাকলে মাতৃভূমি ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে এমন পরিবেশে যাওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা নিজেদের ওপর অবিচার করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, পৃথিবীতে আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? তাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৯৭)

২. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে : যেসব দেশে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে এবং যেখানে বিশেষ একটি ধর্মের অনুসারীরা অন্যদের প্রভাবিত ও পদানত করতে সচেষ্ট নয়; বিশেষত যেখানে ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের অবস্থান নিরপেক্ষ এমন দেশে বৈধ উদ্দেশে যাওয়া এবং অবস্থান করা বৈধ। যেমন চাকরি, লেখাপড়া ইত্যাদি।
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ জানেন যে তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।' (সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ২০)

তবে এমন দেশে অবস্থানের ক্ষেত্রেও শর্ত হলো নিজের, পরিবারের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বিনদারির ব্যাপারে আশঙ্কা না থাকা এবং বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে ঈমান ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসে দুর্বলতা তৈরি না হওয়া। যদি সেখানে যাওয়ার পর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে। জীবন সেখানে যতই প্রাচুর্যময় হোক না কেন।

কেননা আল্লাহ বলেন, 'বলো, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার

আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কোরো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।' (সুরা তাওবা, আয়াত : ২৪)

https://www.dhakapost.com/religion/171818

নাগরিকত্বঃ

জায়েজ নাজায়েজ এর পক্ষে বিপক্ষে সকল আলিমদের একমত যে ইসলামি রাষ্ট্রের ওপরে অমুসলিম রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেয়ার উদ্দেশ্যে, অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব অর্জন করা নাজায়েজ।নাজায়েজের পক্ষে আলিমরা মনে করেন কোন মুসলিম যদি অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব অর্জন করে সে ইসলামের আওতা থেকে বের হয়ে মুরতাদ বলে গন্য হবে। আবার অনেক আলিম মনে করেন যদিও সে মুরতাদ হয়ে যাবে না কিন্তু অনেক বড় গোনাহের কাজ সে করল।
অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা জায়িজ বলেছেন যারা তাদের মত হল।

এখানে স্থান কাল পাত্রভেঙ্গে হুকুম ভিন্নতা থাকবে। কারণ সব অমুসলিম দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকেনা প্রবং আবার কোন উদ্দেশ্য থাকতে চায় বা নাগরিক হতে চায় তাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তির ঈমানের লেভেল কতটুক তাও দেখতে হবে কারণ কোন পরিবেশে থাকলে ঈমানের লেভেল কমবে বাড়বে তা অনেকটা সেই ব্যক্তির ধর্মীয় জ্ঞান এবং তাকওয়ার উপরও প্রভাব ফেলে। সেজন্য যদিও আনেক উলামায়ে কেরামগণ নাগরিকত্ব জায়িজ বলেছেন স্থান কাল পাত্রভেদে। আল্লাহ

বলেন:
اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡنَ یَزۡعُمُوۡنَ اَنَّہُمۡ اٰمَنُوۡا بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَمَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِکَ یُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ یَّتَحَاکَمُوۡۤا اِلَی الطَّاغُوۡتِ وَقَدۡ اُمِرُوۡۤا اَنۡ یَّکۡفُرُوۡا بِہٖ ؕ وَیُرِیۡدُ الشَّیۡطٰنُ اَنۡ یُّضِلَّہُمۡ ضَلٰلًۢا بَعِیۡدًا

তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আর তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায় ?

আন নিসা - ৬০

এখানে তাগূত মানে হল আল্লাহর নীতি- মালার বিপরীত। অর্থাৎ অমুসলিম দেশে জেনে বুঝে আল্লাহর নীতিমালার বাইরে যওয়া এবং তাগুতের আইন মেনে চলা,মেনে যাওয়া নেওয়া আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করার স্বরূপ।

যেখানে ধর্মীয় বিধান পালনে ব্যাগাত ঘটলে অমুসলিম দেশ থেকেও হিজরতের কথা বলেছেন আল্লাহ, সেখানে পার্থিব সুখ সম্বৃদ্ধির জন্য সেখানকার নাগরিকত্ব অর্জন করা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

এই আয়াত তাদের জন্য উদাহরণঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধি- বিধান ও রাসূলের নীতিমালা গ্রহণ করেনা সে তো ইসলামের মধ্যেই আর থাকেনা।

অনেক সময় অনেককে দেখা যায় সেখানে সামরিক কাজে অংশ নেয়ার জন্য যাওয়া হয় সেক্ষেত্রে দেখ যাবে কোন মুসলিম দেশের সাথে যুদ্ধ হলে সেখানে তাকে যোগ দিতে হবে বা চুপ থাকতে হবে।

এটা কোনভাবেই জায়িজ হবে না।

নাগরিকত্ব নিতে হলেও উদ্দেশ্য থাকতে হব দাওয়ার বিষয়। কারণ আল্লাহ তাআলা রাসুল (সাঃ) কে সমগ্র মানব জাতির জন্যই কল্যানের বার্তা দিয়েই পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।
—আল আম্বিয়া - ১০৭

এবং সূরা সাবা ২৮ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ بَشِیۡرًا وَّنَذِیۡرًا وَّلٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۝

আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না —সাবা' - ২৮

তবে অমুসলিম দেশে যে নীতি মালা ইসলামের বিপরীত তার সবটুকু মেনে নিতেই হবে এমন কোন কথা নেই। বরং যেগুলো সাংঘর্ষিক তা সম্মিনিত যত মতামত নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে পরিবর্তনের আবেদনের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে শরিয়ত বিরোধি আইনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এইসব চেষ্টা চালিয়ে গিয়ে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেন মুসলমানরা নির্দ্বিধায় সেখানে দেওয়া এবং বসবাসের জন্য যেতে পারে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে দেখা যায় নিজের দেশের নাগরিকত্ব বহাল রেখেই সেই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ দিয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে নিজের দেশের ইসলামের রীতি-নীতির উপর বহাল থাকা যায়।
।

এ ছাড়াও অমুসলিমদের সঙ্গে লেনদেন, চলাফেরা ও সামাজিক সম্পর্ক রেখে চলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। বরং কেবল তাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়া নিষিদ্ধ, যার ফলে তার ধর্মীয় জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তার ইমানে দুর্বলতা দেখা দেয়। ইসলাম কেবল এমন অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করে, যারা ইসলামের দুশমন তথা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু সাধারণ শান্তিপ্রিয় অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ও ভালো ব্যবহার করতে আল্লাহ বাধা দেন না। কুরআন এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। আল্লাহ বলেন:

لَا يَنْهٰكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجوكم
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين(۝

'দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।' [সুরা মুমতাহিনা: ৮।

খেয়াল রাখা উচিত যে, কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষিত সম্পর্ক বহাল রাখা আর কোনো একটি দেশের সাধারণ অমুসলিমদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা এক জিনিস নয়।
যদিও বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সাধারণ কোনো কারণে অমুসলিম দেশে থাকা বা নাগরিকত্ব নেওয়া উচিত নয় স্বদেশে থাকাটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে সেইফ। তবে একান্ত প্রয়োজনে অনেক দোষেরও নয় যদি দ্বীন পালনে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সেখানে থাকাটা বাধা না হয়।
এবং নিজেকে ইসলামের একজন রিপ্রেজেন্টেটর হিসেবে ভেবে সে অনুযায়ী চলতে পারার মনস্থির করা যেন আশেপাশের মানুষ তাকে দেখে প্রভাবিত হয়।

অমুসলিম দেশে যাওয়া যাবে না যে কারণে

বিভিন্ন কারণে কিছু বিধি-বিধান মেনে অমুসলিম দেশে যাওয়ার শিথিলতা থাকলেও যেসব কারণে যাওয়া যাবে না

ভোগ-বিলাসের জীবন যাপনের লক্ষ্যে

যদি স্বদেশে কোন ব্যক্তির এই পরিমাণ জীবিকার বন্দোবস্ত থাকে, যার মাধ্যমে সেই শহরের অবস্থানরত অন্যান্য মানুষের জীবন চলার মান অনুযায়ী সেও চলতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারপরও শুধু জীবন চলার মান আরো উন্নত করার উদ্দেশ্যে, সম্পদ বৃদ্ধি এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে থাকে, তাহলে এ জাতীয় হিজরত মাকরুহর আওতাভুক্ত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কোনরূপ ধর্মীয় বা পার্থিব প্রয়োজন ছাড়া সেই রাষ্ট্রে বসবাস তাদের প্রচলিত অপসংস্কৃতির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ারই নামান্তর হবে। বিনা প্রয়োজনে নিজের দ্বীন-ধর্ম এবং আখলাক-চরিত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না। কেননা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কেবল আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস এবং সুখ-স্বর্গের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে, তার মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি দুর্বল

হয়ে যায় এবং খুব দ্রুতই এ ধরনের মানুষ বিধর্মীদের আচার-আচরণের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়।

এ কারণেই হাদীস শরীফে তীব্র প্রয়োজন ছাড়া মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এ সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফে হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযি.) থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله

'যে ব্যক্তি মুশরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করে, সে তাদেরই মত।' (আবু দাউদ)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন :

أ
نا بربي من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله لم؟ قال لا ترى أي ناراهما.

'আমি ওইসব মুসলমানদের থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী? জবাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ইসলামের অগ্নি আর কুফুরের অগ্নি একই সঙ্গে থাকতে পারে না। তোমরা এটি পৃথক করতে পারবে না যে, এটি কি মুসলমানদের অগ্নি না মুশরিকদের অগ্নি।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের অনেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। যেমন কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে এর অর্থ হল এই যে, হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলমান আর মুশরিক সমকক্ষ হতে পারে না। উভয়ের আহকাম ভিন্ন ভিন্ন। আবার কোন কোন আলেম বলেছেন, এই হাদীসটির সারমর্ম হল এই যে, আল্লাহ তাআলা দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফরকে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের রাষ্ট্রে তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা জায়েয নেই। কেননা যখন মুশরিকরা

তাদের (বিজয়ের) মশাল সমুজ্জল করবে, আর তাদের সঙ্গে মুসলমানরা নীরবতা অবলম্বন করে থাকবে, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটিই মনে হবে যে, তারা (মুসলমানরা) এদেরই অন্তর্ভুক্ত। ওলামায়ে কেরামের এই ব্যাখ্যা দ্বারা একথাও পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি কোন মুসলমান ব্যবসা

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেও কাফেরদের রাষ্ট্রে গমণ করে, তাহলে তার জন্য সেখানে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা মাকরূহ।' (মাআলিমুস সুনান লিল-খাত্তাবী : [আবু সুলায়মান আল খাত্তাবী, মৃত্যু : ৩৮৮ হি.] খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৩৭)

হযরত মাকহুল (রাযি.) থেকে সুনানে আবু দাউদের মারাসিলে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لا تتركوا الذرية ازاء العدو.

'নিজের সন্তানদের মুশরিকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেবে না।

এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবলমাত্র চাকরি করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং তাদের জনসংখ্যা বর্ধিত করার কারণ হওয়া এমন একটি (ধিকৃত) কাজ, যার দ্বারা তার বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন হয়ে যায় ।

বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে

কোন ব্যক্তি যদি লোক সমাজে সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কিংবা অন্য মুসলমানের ওপর নিজের বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে কিংবা দারুল কুফরের নাগরিত্ব এবং জাতীয়তাকে দারুল ইসলামের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করে তাদের ন্যাশনালিটি গ্রহণ করে থাকে অথবা তার পার্থিব জীবনের থাকা-খাওয়া ও চাল-চলনে তাদের নীতি গ্রহণ করে বাহ্যিক জীবনে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করার জন্য এবং তাদের মত হয়ে যাওয়ার জন্য বসবাস করে থাকে তাহলে এ জাতীয় যে

কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হিসেবে গণ্য হবে। এই বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট যে, এর জন্য কোন দলিল পেশ করা প্রয়োজন নেই।

পরবর্তী প্রজন্মের জন্য

ইসলাম মা-বাবা ও অভিভাবককে সন্তান-সন্তুতি ও অধীনদের দ্বিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্ব দিয়েছে। কেউ যদি এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তবে পরকালে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'প্রত্যেক নবজাতক ফিতরতের (ইসলামের) ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তাঁকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিউপাসকে পরিণত করে। ' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৮৫)
বিশেষত অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিম পরিবারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানদের অনেকেই ইসলাম ও ইসলামী জীবনধারা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

হযরত মাকহুল (রাযি.) থেকে সুনানে আবু দাউদের মারাসিলে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لا تتركوا الذرية ازاء العدو.

'নিজের সন্তানদের মুশরিকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেবে না।

তীর্থস্থান পরিদর্শন

বিনোদন ও অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে নোংরা ও অশ্লীল-পরিবেশে ভ্রমণ করা জায়েয নেই। কেননা, মুমিন গুনাহর পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখার ব্যাপারে আদিষ্ট।

ইসলামী স্কলারগন বলেনঃ
ভ্রমণ যদি হয় মহৎ কোনো উদ্দেশ্য তাহলে ইসলামে ভ্রমণের অনুমতি আছে; বরং ক্ষেত্র বিশেষ ভ্রমণ একপ্রকার ইবাদতও বটে। যেমন,

১. হজ ও ওমরাহর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। হজের ভ্রমণ হয় হজের মাসগুলোতে আর ওমরাহর ভ্রমণ হতে পারে সারা বছর।

২. ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। এ উদ্দেশ্যে ভ্রমণ নবী-রাসুলগণ, সাহাবায়ে কেরাম কিংবা নেককারগণ করেছেন। যাদের ভ্রমণ-কাহিনি আজও ইসলামের ইতিহাসের শোভা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে এবং মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। বরং বলা যায়, এই জাতীয় নেক-ভ্রমণের উসিলাতেই ইসলাম আজ সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত।
৩. জিহাদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। যেমন, এ মর্মে হাদিস শরিফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
নিশ্চয় আমার উম্মতের ভ্রমণ হল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। (আবু দাউদ ২৪৮৬)

৪. ইলম শেখা, শেখানো ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। বিশেষত এ ভ্রমণের উসিলাতেই আমরা হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার পেয়েছি। এমনকি খতিব বাগদাদি রহ. এ শ্রেণীর ভ্রমণ-কাহিনি নিয়ে الرحلة في طلب الحديث (হাদিস অন্বেষণে ভ্রমণ) নামক বিশাল কিতাবও লিখেছেন।

৫. শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। যেমন, এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। (সূরা নামল ৬৯)

৬. আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা অবলোকন করে ঈমান ও আমলকে মজবুত করা এবং দৈহিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (সূরা আনকাবুত ২০)
ফাতাওয়া লাজনাতিদ্দায়িমা (২৬/২২৪)-তে বলা হয়েছে,
إذا كانت هذه السياحة مشتملة على تسهيل وتيسير فعل المعاصي والمنكرات والدعوة إليها : فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عوناً على معصية الله ومخالفة أمره ، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه

'যদি ভ্রমণটি হয় এমন যে, এর কারণে গুনাহ ও নাফরমানি সহজ হয় এবং গুনাহর প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয় তাহলে যে মুসলিম আল্লাহ ও আখেরাত দিবসকে বিশ্বাস করে তার জন্য জায়েয নেই, আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করার কাজে সহযোগিতা করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ছেড়ে দিবে আল্লাহ এর পরিবর্তে তাকে এর চাইতে উত্তম জিনিস দান করেন।'

এধরণের ভ্রমণ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,
ما السياحة من الإسلام في شيء ، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين
এধরণের ভ্রমণ ইসলামে নেই। নবীগণ কিংবা নেককারগণ এধরণের ভ্রমণ করেন নি। (তালবীসে ইবলীস ৩৪০)
সুতরাং অমুসলিমদের কোন তীর্থস্থানে ভ্রমন করা(বর্তমান প্রেক্ষাপটে) জায়েজ নেই।
ifatwa.info

কিছু প্রতিবন্ধকতা

অমুসলিম রাষ্ট্রে যেভাবেই থাকুক না কেন কিছু প্রতিবন্ধকতা ফেইস করতেই হয়।যেমন
১.পর্দা
২.ইবাদত
৩.হালাল খাবার ইত্যাদি

পর্দা

অমুসলিম এই সভ্যতার দাবীদারগণ পর্দাকে অবনতির কারণ ও মহিলাদের উদ্ভাবন ও উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করে এবং তাদের মতে, পর্দা এমন মারাত্মক প্রতিবন্ধক যা মহিলাদের জন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বড় বাধা এবং তা উন্নয়নশীল দেশগুলো সভ্যতার যে অগ্রগতিতে পৌঁছেছে সে অগ্রগতিরও বড় বাধা।তবে কি তারা বলছে উন্নয়ন ও সভ্যতা- সংস্কৃতির জন্য নারীদেরকে পুরুষদের সাথে তার পাশবিক সম্ভোগ ও পশুত্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করার জন্য অংশগ্রহণ শর্ত?

ইতোপূর্বেই অধিকাংশ আরব ইসলামী দেশগুলোর মহিলারা পর্দা বর্জন করে নগ্নতা গ্রহণ করেছে, পর্দাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতঃ পদদলিত করে পুরুষদের সাথে কর্মের জন্য বেরিয়ে পড়েছে এবং তাদের সাথে অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে তারা জড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেসব দেশের নারীদের পর্দা থেকে নগ্নতা গ্রহণের ফলে কি তারা উন্নতি করে ফেলেছে?

তারা কি নারী- পুরুষের সংমিশ্রনের কারণে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির উচ্চশক্তি ও উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে? উন্নয়ণশীল দেশসমূহ যে শক্তি ও উন্নতিতে পৌঁছেছে তারা কি সে অবস্থানে পৌঁছতে পেরেছে? যাদের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটোর অধিকার রয়েছে, সেই বৃহৎ পরাশক্তিধর দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত কি তারা হতে পেরেছে? তারা কি অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, সামাজিক ও চারিত্রিক সমস্যাবলী থেকে মুক্তি পেয়েছে? তাহলে এটা স্পষ্ট নয় কি যে তাদের আসল উদ্দেশ্য উন্নতি নয় বরং নগ্নতা। তাহলে তাদের দেশে পরিপূর্ণ পর্দা মেইনটেইন করা কতটুকু সম্ভব? যদিও আজ কিছুটা হলেও সম্ভব তাহলে আগামীতে আমার সন্তান পারবে কিনা তাদের বাকি সব আইন কানুন নিয়ম নীতি দেখলেই স্পষ্ট।

ইবাদত

কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম রক্ষার কয়েকটি উপায় বর্ণনা করা হলো। যার মূলকথা হলো, ইসলাম ও মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অন্তরে ধারণ করা এবং হীনমন্যতার শিকার না হওয়া।
মুমিন অন্তরে এই বিশ্বাস লালন করে যে, মুসলমানই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই মুসলিম পরিচয় ধারণ করা লজ্জার নয়। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজ থেকে নিষেধ কোরো এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করো। ’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)
একজন মুসলমানের জন্য মুসলিম পরিচয় বহন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে তা অপরিহার্য।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কোরো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ কোরো না। ’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২)

আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরবিদরা বলেন, তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির জীবনই মুসলমানের জীবন। আর তা হলো জীবনের সর্বত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য। (মাআরেফুল কোরআন : ২/১১০

পরিচয় ত্যাগের ক্ষতি

কোরআন ও হাদিসের একাধিক স্থানে মুসলিম পরিচয় ত্যাগ করার ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। ’ (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪০৩১)

অন্য হাদিসে নবীজি (সা.) বলেন, ‘দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন কোরো, আর ইহুদিদের অনুকরণ কোরো না। ’ (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫০৭৩)

মনে রাখতে হবে, কোনো অমুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলাম ও ইসলামের পরিচয় ত্যাগের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। কেননা তারা মুসলিমদের ঈমানহারা না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না। পবিত্র এই বাস্তবতায় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ কতই না চমৎকার বলেছেন, ‘ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তোমরা প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো। বলো, আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ। ’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১২০)

তাহলে অমুসলিম দেশে মুসলমানদের কতটুকু এর সুযোগ থাকে তা দেখার বিষয়।

হালাল খাবার

মুসলমানদের যেকোনো গোশত খাওয়ার অনুমতি নেই। দুই শর্তে মুসলিম গোশত খেতে পারে। প্রথমত পশু-পাখি হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়ত জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে। তবেই সেই গোশত মুসলমানদের জন্য খাওয়া জায়েজ। কোনো হালাল পশুও জবাইয়ের সময় যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া না হয়, সেই গোশত মুসলমানদের খাওয়া জায়েজ নেই। এমনকি মুসলিম রেস্টুরেন্টেও ‘যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম না নেওয়া হয়, তাহলে জন্তুটি মৃত (অর্থাৎ মৃত পশুর হুকুমের মতো), তা খাওয়া যাবে না। তবে যদি ভুলবশত (আল্লাহর নাম) ছেড়ে দেয়, তাহলে খাওয়া যাবে।’ (আল বিনায়াহ খ: ১০ পৃ-৬৪৫)

পবিত্র কোরআনের দলিল—وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ অর্থ: ‘যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ।’ (সুরা আনআম: ১২১হাদিস শরিফে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ

(স.)-এর কাছে ওহি নাজিল হবার আগে জায়েদ ইবনু নুফাইল এর সঙ্গে ‘আসফালি-বালদাহ’ নামক স্থানে সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁর (স.)-এর সামনে দস্তরখান বিছানো হয়। (যেখানে কিছু পাকানো গোশতও রাখা হয়) রাসুল (স.) তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর বলেন, আমি সে প্রাণী খাই না, যা তোমরা মূর্তির নামে জবাই করো। আমি শুধু ওই প্রাণীই ভক্ষণ করি যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে। (সহিহ বুখারি: ৩৮২৬, ৩৬১৪)।

উপসংহার

অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস বা সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ মানেই যে নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িয়ে পড়া নয়। তবে মুসলিমদের জন্য নিজের দেশে থেকে ইসলামি ভাবধারায় জীবনযাপনই উত্তম। অন্যান্য রাষ্ট্রে ভ্রমণ বা বসবাসকে স্রেফ প্রয়োজনের স্তরে রাখা যেতে পারে। কেউ কোনো কারণে অন্য দেশে বেশি নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থা লাভ করলে তার জন্য সেখানে বসবাসের সুযোগ রয়েছে। তবে সেই ক্ষেত্রে চারটি শর্ত মেনে চলতে হবে:

১. সেখানে বসবাস করতে গিয়ে নিজের ধর্মীয় স্বভাব-চরিত্র বিসর্জন দেওয়া যাবে না। নিজের বা সন্তান-পরিজনের ধর্মকর্মকে কোনো ধরনের শঙ্কার মুখে ফেলা যাবে না। মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। দীনপালন বিঘ্নিত হলে সেখানে বসবাস করা জায়িজ হবে না। গিয়ে থাকলে স্বদেশে ফিরে আসা ওয়াজিব।

২. মুসলিমদের সেখানে ইসলামের সুন্দর জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি হতে হবে, যেন তাঁদের কাজকর্ম ও সততার দ্বারা অমুসলিম প্রতিবেশীরা প্রভাবিত হয়।

৩. দেশান্তরকে মনে মনে পবিত্র হিজরত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে ওই ব্যক্তির প্রবাসজীবন সুন্দর ও পুণ্যময় হবে এবং তাঁর চারপাশের অন্যান্য মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিবেশী তাঁর মাধ্যমে কল্যাণসাধন, মহত্ত্ব ও সদাচারে অনুপ্রাণিত হবে।

৪. দেশান্তরিত মুসলিম সর্বদা নিজেকে এবং নিজের পরিবার ও সন্তানদের সব ধরনের মানসিক ও চারিত্রিক রোগ এবং নেতিবাচক পরিবর্তন থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করে নিষ্কলুষ জীবনযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

রেফারেন্সঃ অমুসলিম দেশে মুসলমানদের থাকার বিধান বই থেকে